খসড়া, ১১ মে, ২০১৯

ফিরিয়ে আনতে হবে হৃত গৌরব
মানবিক কর্মসূচি এবং উন্নয়নে সমান অংশীদার সিএসও/এনজিও

"বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া" সম্পর্কে প্রাথমিক ঘোষণাপত্র

১। সমন্বয় প্রক্রিয়ার ধারণা

বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিও, সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন) নেটওয়ার্কসমূহের মধ্যে ন্যূনতম কিছু লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য গঠন করা হয়েছে "বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া" বা "BD CSO-NGO Coordination Process (BD Coordination)"। এই প্রক্রিয়ায় দেশের এনজিও ও নাগরিক সংগঠনসমূহ সাধারণ ও ন্যূনতম নীতিমালার আলোকে পারস্পারিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ সক্রিয় পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার (প্রাইভেট সেক্টর) সাথে অধিপরামর্শ (এডভোকেসি) করতে পারে। এই উদ্যোগ মূলত উন্নয়ন ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার (প্রথম পক্ষ) ও বাজারের (দ্বিতীয় পক্ষ) সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নাগরিক সমাজের সার্বিক বিকাশে কাজ করবে, যাকে একটি "প্রক্রিয়া" নামে চিহ্নিত করা হবে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্কসমূহের অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা ও সংহতি নিয়ে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করবে বিডি কোঅর্ডিনেশন।

২। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে চলমান বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যেমন উন্নয়ন সহায়তার স্থানীয়করণ কর্মসূচি, উন্নয়ন কার্যকারিতায় নাগরিক সমাজ, এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাথে যুক্ত কিছু এনজিও ও নাগরিক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এনজিও ও নাগরিক সংগঠনের কয়েকটি নেটওয়ার্ক যেমন, এডাব, সিডিএফ, এফএনবি ও বাপা এবং স্থানীয় কয়েকটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্প্রতি দেশজুড়ে (৯টি বিভাগ এবং ২৪টি জেলায়) স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক কিছু নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর বক্তব্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হচ্ছে দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, যারা এক পর্যায়ে বাংলাদেশে স্থানীয়করন কর্মসূচির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। যা বাংলাদেশে উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের (এইড) স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সমন্বিত ও কৌশলগত পদক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

৩। উন্নয়নের কার্যকারিতা: আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং বাংলাদেশে এর প্রয়োজনীয়তা

জাতিসংঘ, ওইসিডি সদস্যভুক্ত দেশ এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শুরু হওয়া "উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের কার্যকারিতা (Aid Effectiveness)" সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয় ২০০২ সালে মনতেরেই কনসেনসাস থেকে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে প্যারিস ঘোষণায় প্রথম দেশীয় মালিকানাকে এবং ২০০৮ সালে আক্রা এজেন্ডা অব একশনে সুশীল সমাজকে উন্নয়নের পক্ষ হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে আলোচনাটির নতুন নামকরণ হয় "উন্নয়নের কার্যকারিতা (Development Effectiveness)"। ২০১১ সালে বুসান ঘোষণা ও ২০১৬ সালে নাইরোবি ঘোষণার মাধ্যমে এই আলোচনা আরো ইতিবাচক গতি পায়।

নবগঠিত "উন্নয়নের কার্যকারিতা" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র, বাজার এবং সুশীল সমাজ এই তিন পক্ষের মিথষ্ক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমুখী অংশীজনদের নিয়ে একটি অফিসিয়াল আন্তর্জাতিক প্ল্যাটপরম গঠিত হয়, যার নাম "গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন" (GPEDC)[১]। বাংলাদেশ, জার্মানি আর উগান্ডার অর্থমন্ত্রীগণ এই ফোরামের কো-চেয়ার। জিইপিডিসি'র কার্যকর পরিষদের ১৪তম সভাটি ২০১৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়নের মূলধারার এই প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বিশ্বের সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের পৃথক একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া। সে সময় বাংলাদেশে প্রায় ৮০টি এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠন দুইদিনের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এই আলোচনাকে কার্যকর ধারায় নিয়ে আসতে অবদান রাখে।

নিজেদের প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য করতে বিশ্বের সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো নিজেদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার জন্য একটি ৮টি ধারা সংবলিত একটি নীতিমালা ঘোষণা করে ২০১০ সালে, যা ইস্তাম্বুল ঘোষণা নামে পরিচিত।[২] কোস্ট ট্রাস্ট এই প্রক্রিয়ায় প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস উইংয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সুশীল সমাজ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে।[৩] বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল পর্যায়ে সমভাবে যুক্ত থাকার জন্য ও নিজেদের যথাযথ অবদান নিশ্চিত করার জন্য এনজিও ও নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর এখানে স্বতস্ফূর্থভাবে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪। অংশীদারিত্বে সমতা প্রসঙ্গ: আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুসারে প্রয়োজনীয়তা

মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে স্থায়িত্বশীলভাবে স্থানীয় এবং জাতীয় সংগঠনসমূহের যুক্ত হবার বিষয়টিকে প্রথম ও প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছে বৈশ্বিক পক্ষসমূহ। এই বিষয়ে বৈশ্বিক আলোচনা শুরু হয় ২০০৬ সালে। ২০০৭ সালে অংশিদারিত্বের নীতিমালা (Principles of Partnership- PoP) নামে একটি দলিল প্রণীত হয়। বিশ্ব ব্যাংক, রেডক্রিসেন্ট-রেডক্রস, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং

---

1 www.effectivecooperation.org

2 http://cso.csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/hlf4_72.pdf

3 কোস্ট ট্রাস্ট এই ধারণাকে জনপ্রিয়া করতে এই দলিলের বাংলা অনুবাদ করেছে, যা এখানে পাওয়া যাবে: http://coastbd.net/wp-content/uploads/2015/11/Istanbul-Principle-Bangla-Final-.pdf

জাতিসংঘ সংস্থাসহ ৪০টি প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালা স্বাক্ষর করে।[৪] যার মূল বিষয়গুলো হলো: সমতা (Equality), স্বচ্ছতা (Transparency), ফল অভিমুখী এপ্রোচ (Result-Oriented Approach), দায়িত্বশীলতা (Responsibility) ও পরিপূরক ভূমিকা (Complementarity)।

মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত সিএসও/ এনজিও সংগঠসমূহের আন্তর্জাতিক কাউন্সিল আইসিভিএ-এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, অংশিদারিত্বের নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিলো-স্থানীয় এবং জাতীয় সংগঠনসমূহের মানবিক সহায়তার সক্ষমতাকে অবহেলা করার মানসিকতাসহ মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা উত্তরণের জন্য কাজ করা।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা কেবল জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি, আন্তঃসরকারী কিংবা আন্তর্জাতিক এনজিওর জন্যই প্রযোজ্য- এমন নয়। বরং এই নীতিমালা মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকল পক্ষ যেমন- সরকার, বুদ্ধিজীবী, প্রাইভেট সেক্টর এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ- সবার জন্য একটি স্বীকৃত কর্মকাঠামো যা আরও বেশি সমতার ভিত্তিতে গঠনমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। মানবিক সংকটে সাড়াপ্রদানকারীদের সংখ্যা ও বৈচিত্র প্রতিদিন বাড়ছে- এই বাস্তবতায় অংশিদার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই নীতিমালা মূল নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশী এনজিও এবং সিএসও এই নীতিমালা সোচ্চারভাবে তুলে ধরেছে একটি ফোরামের মাধ্যমে, ২০১৭ সালের ১৯ আগস্ট।[৫] যেখানে জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা আরো এগিয়ে নিতে হবে।

৫। আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুসারে স্থানীয়করণের প্রয়োজনীয়তা

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের উদ্যোগে ২০১৪ সালে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট[৬] প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা, বিশ্বব্যাপী কয়েক দফা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এবং মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ২০১৬ সালে ইস্তানবুলে এটি পরিণতি লাভ করে যা গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতি নামে প্রকাশিত হয়।[৭] এই গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করে জাতিসংঘের প্রায় সকল এজেন্সি, আন্তর্জাতিক এনজিওদের নেটওয়ার্ক, রেডক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থা।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটের আলোচনার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক এনজিও/ সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ একটি পৃথক প্রক্রিয়া শুরু করে, যার নাম চার্টার ফর চেঞ্জ[৮]। এ পর্যন্ত চার্টার ফর চেঞ্জ দলিলে স্বাক্ষর করেছে প্রায় ৫০টি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং এটি অনুসমর্থন করেছে উন্নয়নশীল দেশের প্রায় ১৫০টি জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিও/ সিএসও। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের জানা বোঝা বাড়াতে এগুলো বাংলা অনুবাদ করা হয়। যেগুলো হলো:

- ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট প্রক্রিয়া[৯]
- গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতিসমূহ[১০]
- চার্টার ফর চেঞ্জ প্রতিশ্রুতিসমূহ[১১]

এ ছাড়াও আইসিভিএ (ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ভলান্টারি এজেন্সিজ) এই বিষয়গুলো জানা ও চর্চার জন্য একটি বিশেষ পুস্তিকা বা ম্যানুয়াল প্রকাশ করেছে ইংরেজিতে।[১২]

এই প্রতিশ্রুতিগুলোকে মানবিক এবং উন্নয়ন সহায়তায় স্থানীয়করন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক চুক্তি (Moral Agreement) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো মূলত স্থানীয় সংস্থা ও জাতীয় নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার পাশাপাশি পরিচালন ব্যয় হ্রাসের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কথা বলে। গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতিতে প্রথমবারের মতো স্থানীয়করণের বিষয়গুলো ১০টি কর্মধারা এবং তার অধীনে ৫১টি পরিমাপযোগ্য নির্দেশকের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

৬। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, স্থায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতার লক্ষ্যে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি: কার্যক্রমের নব-কৌশল

ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটের সময় জাতিসংঘের কিছু সংস্থা কার্যক্রমের নব-কৌশল বা New of Way of Working নামের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে[১৩]। এর মূল লক্ষ্য ছিলো স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে কাজ করা। এই একই ধরনের চেতনা থেকে উৎসাহিত হয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ৭১/২৪৩ নাম্বার রেজুলেশনের মাধ্যমে QCPR (Quadrennial Comprehensive Policy Review) গ্রহণ করে। এই রেজুলেশন মূলত উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ অর্জনে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

---

[4] https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
[5] http://coastbd.net/wp-content/uploads/2018/08/18-expectations-and-demands-from-Bangladeshi-NGOs_Bangla_for-19th-Aug-Press-Conf.pdf
[6] www.agendaforhumanity. org
[7] https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2018/Jan/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
[8] https://charter4change.org
[9] http://coastbd.net/wp-content/ uploads/ 2015/ 11/WHS-Outcome-Bangla-.pdf
[10] http://coastbd.net/wp-content/uploads/2015/11/Grand-Bargain-Final-.pdf
[11] http://coastbd.net/wp-content/uploads/2015/11/Charter-for-Change_Final.pdf
[12] https://www.icvanetwork.org/resources/grand-bargain-explained-icva-briefing-paper-march-2017
[13] https://www. icvanetwork.org/topic-five-%E2%80%93-new-way-working-what-it-what-does-it-mean-ngos

জাতিসংঘের মহাসচিব মি. আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, “যে কোনো সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা, সংকটের ফলে কাঠামোগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা এবং নতুন করে যাতে কোনো সংকট বা অস্থিতিশীলতা তৈরি না হয় তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে মানবিক সহায়তাকারী ও উন্নয়নের পক্ষসমূহকে শুরুতেই কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। কার্যক্রমের নব কৌশল বা নিউ ওয়ে অব ওয়ার্কিং এপ্রোচ বিষয়ে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটে সকলেই সম্মত হয়েছিলেন। এটি অর্জন করতে হলে এই লক্ষ্যে কর্মরত প্রতিটি পৃথক এজেন্সি পর্যায়ে আরো বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তার ফল গোটা জাতিসংঘ ব্যবস্থায় অবদান রাখে। একটি শক্তিশালী জবাবদিহিতার সংস্কৃতির জন্য আরো প্রয়োজন হবে কার্যকর ও স্বাধীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা।”

কার্যক্রমের নব কৌশল সম্পর্কে UN OCHA একটি বই[১৪] প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, যৌথ ফলাফলগুলোর উপর শক্তিশালী জাতীয় ও স্থানীয় মালিকানা এই কার্যক্রমের নব কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উন্নয়ন সহযোগিতা এবং সংকট প্রতিরোধের কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাইরে থেকে কোনও সংগঠন বা পক্ষকে এনে প্রতিষ্ঠা না করে, স্থানীয় এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার (“reinforce and do not replace”) নীতিমালা ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটের অন্যতম প্রাপ্তি। স্থায়িত্বশীলভাবে প্রয়োজন, ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা কমাতে মানসিকতা ও আচরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে এই নীতিমালা প্রয়োজন।

বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি এবং সুশীল সমাজের জন্য সুযোগ তৈরি করতে জাতিসংঘই সর্বশেষ ভরসা। এ কারণেই আশা করা হয় যে, জাতিসংঘ শক্তিশালী সুশীল সমাজ সংগঠন বিকাশেও ভূমিকা পালন করবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকাশিত দলিলে দেখা যায়, এ ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছাও রয়েছে। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কিছু এজেন্সির প্রকল্পসমূহ সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ। রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, যেখানে মোট তহবিলের প্রায় ৬০% এর বেশি ব্যয় হচ্ছে জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে। একটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহের বড় আকারের পরিচালনা কাঠামো স্থানীয় এনজিও/সিএসও-র বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে কি না তা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

৯০-এর দশক থেকে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এজেন্সি যেমন ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি কর্তৃক কক্সবাজারে সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে এ এলাকায় স্থানীয় এনজিওদের কাজ করার সুযোগ সীমিত হয়েছে। যার ফলে, অন্য জেলার তুলনায় কক্সবাজারে স্থানীয় এনজিও/সিএসও-এর সংখ্যা কম। কুড়িগ্রামে এনজিও ব্যুরো নিবন্ধিত স্থানীয় এনজিওর সংখ্যা যেখানে ১৫টিরও বেশি, কক্সবাজারে এ সংখ্যা মাত্র ৭। মানব উন্নয়নের নানা সূচকে কক্সবাজার ও তার উপজেলাসমূহ জাতীয় গড় থেকে অনেক পিছিয়ে থাকায় এখানে স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের প্রয়োজন রয়েছে।

গ্র্যান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ থাকলেও জাতিসংঘের নেতৃত্বে সামগ্রিক মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে নানা কারণে সমন্বিত ও সাধারণ পরিবহন পুলের বিষয়টি বাস্তবায়িত না হওয়া, বিদেশি বিশেষজ্ঞের উপর বেশি নির্ভরতা এবং সংস্থাগুলোর বড় আকারের পরিচালন ব্যয়ের মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং মাঠ পর্যায়ে সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন ধীরে ধীরে স্থানীয় সংগঠনের হাতে ন্যস্ত করার প্রক্রিয়া এর একটি সমাধান হতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিংঘের এজেন্সিসমূহের ইতিবাচক ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭। বাংলাদেশের বাস্তবতা: ডিমান্ড সাইড মোবিলাইজেশন

উপরে উল্লিখিত বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিগুলো এক ধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং উপরের দিক থেকে বা সাপ্লাই সাইড থেকে দেওয়া কিছু প্রতিশ্রুতি। স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলো দাবি হিসেবে এগুলো তুলে ধরতে না পারলে অর্থাৎ এর ডিমান্ড সাইড মোবিলাইজেশন না হলে এগুলোর হয়ত সামান্যই বাস্তবায়িত হবে এবং একই বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে। কারণ, দুঃখজনক হলেও সত্য, ২০০৭ সালে অংশীদারিত্বের নীতিমালা (পিওপি) স্বাক্ষরের পর এর অগ্রগতি বিষয়ে বলতে গেলে আর কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

২০১৬ থেকে ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশের কিছু এনজিও/সিএসও উপরোক্ত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে এবং তখন স্থানীয় পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হয়েছে। বাপা, এডাব, সিডিএফ এবং এফএনবি’র অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা নিয়ে, কিছু স্থানীয় সংগঠনকে সাথে নিয়ে কোস্ট ট্রাস্ট দেশের সকল বিভাগে স্থানীয়করণ, উন্নয়নের কার্যকারিতাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার উপর কর্মশালা আয়োজন করেছে। এই প্রক্রিয়া আরও ২৪টি জেলায় চলমান রয়েছে। বিভাগীয় কর্মশালাগুলোতে দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে একেবারে তৃণমূলের চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ৩টি পৃথক বিষয়ে সুপারিশমালা উঠে আসে। তার প্রথমটি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে দাতা সংস্থা ও সরকারের কাছে স্থানীয় সংগঠনসমূহের প্রত্যাশা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দেশীয় এনজিও/ সিএসওদের নিজস্ব জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, এই দাবি আদায়ে অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয়রা নিজেরা স্বাধীনভাবে কী কী করতে পারে। এ বিষয়ক আলোচনার ফলাফল ও দাবি আগামী ৬ জুলাই ২০১৯ ঢাকায় একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতে পারে।

এছাড়াও ২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৫০টি এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠন একত্রে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যাশার সনদ বা চার্টার অব এক্সপেক্টেশন ঘোষণা করে। মোট ১৮টি সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশার এই সনদ ২০১৭ সালের ১৯ আগস্ট, ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান দিবসের প্রাক্কালে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়[১৫]। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের এ দেশীয় প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি ছিল। প্রত্যাশা সনদের বক্তব্য গণমাধ্যমেও বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

---

14 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf

15 http://coastbd.net/our-common-space-our-complementary-roles-equitable-partnership-for-sovereign-and-accountable-civil-society-growth

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপক সংখ্যায় আগমন একটি বাস্তবতা। যার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বৃহৎ আকারে চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রটিকে স্থানীয়করণ কর্মসূচির একটি গবেষণা ক্ষেত্র বা ল্যাবরেটরি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এবং রোহিঙ্গা সংকটের নানা দিক নিয়ে প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য "কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম"[১৬] নামে স্থানীয় সংগঠনসমূহের একটি প্লাটফরম গঠিত হয় এবং তারা কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এর অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার, জাতীয়-স্থানীয় এনজিও, সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের কর্মসূচি বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রচারাভিযান এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের খবর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়[১৭]। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবিরাম প্রচারাভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রান্ড বারগেইনের পক্ষ থেকে একটি মিশন বাংলাদেশে এসে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে এবং সংশ্লিষ্ট অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে রোহিঙ্গা কার্যক্রমে তিন বছরের মধ্যে স্থানীয়করণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়। সেখানে তারা ২৬ দফা সুপারিশ প্রদান করে।[১৮]

স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারাভিযান ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে অক্সফামের ইএলএনএইচএ (ELHNA) থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। কক্সবাজারে কিছু অনুষ্ঠান আয়োজনে আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে আইওএম, খ্রিস্টিয়ান এইড এবং এসিএফ। তাদের এই অবদান অনস্বীকার্য।

৮। বিডি কোঅর্ডিনেশন প্রক্রিয়ার নেপথ্য বিবেচনাসমূহ

আন্তর্জাতিক এই ইতিবাচক প্রক্রিয়াগুলোর সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সিএসও-এনজিও সার্বভৌম ও স্থায়িত্বশীল তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে সক্রিয় হতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যায়:

(ক) সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, **জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ নীতিগতভাবে স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। তবে, জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয়করণ বাস্তবায়নে তাদের পরিচালনাগত নীতিমালা বা পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।** তাদের অংশিদারিত্বের নীতিমালায় Criteria based অংশিদারিত্ব, প্রায়োগিকভাবে স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি, সর্বোপরি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট এড়ানোর বিষয়গুলো দৃশ্যমান হওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিও/সিএসও সমূহের বিকাশ ও পেশাগত সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ফলে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কাজ করার এখন আর তেমন প্রয়োজন নেই, স্থানীয় অংশীদারদের মাধ্যমেই তা হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা কাজ করলেও তাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের শতকরা হার এক অংকে সীমিত রাখা উচিৎ। অনেক সময় দেখা যায়, স্থানীয় সংগঠনের অংশিদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তাদের সক্ষমতা সমন্বয়ের (capacity convergence) বদলে তথাকথিত সক্ষমতার অভাবের (capacity deficit) দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। অনেক সময় স্থানীয়করণকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়, যদিও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহেরই ঝুঁকি নেওয়ার কথা। এই বিষয়ে ইউএসআইডি, কেয়ার, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল, মারসি করপস, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহযোগিতায় ইন্টার‍্যাকশন নামের একটি সংস্থা একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে[১৯]। এতে অংশীদারিত্বে যৌথভাবে ঝুঁকি বহন করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

(খ) স্থানীয়করণের দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হচ্ছে স্থানীয় সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে (আন্তর্জাতিক এনজিও কনসোর্টিয়ামের প্রতিবেদন)[২০] এবং আরেকটি হলো সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে (আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন)[২১]। প্রতিবেদনগুলোতে দেখানো হয়েছে সম-অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকৃত চিত্রটি কী? বাংলাদেশসহ দক্ষিণ গোলার্ধের এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো সব সময়ই উপ-ঠিকাদারির (sub-contracting) পরিবর্তে সম-অংশিদারিত্বের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সক্ষমতা নিয়ে বিতর্ক আছে, সামাজিক পরিস্থিতির ভিন্নতার আলোকে প্রকৃতপক্ষে এর কোনো সীমারেখা নাই। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো ইতিমধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও এখন বেশি প্রয়োজন সম-অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার।

(গ) জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর নিজেদের মধ্যে একটি ঐক্য আছে, যা ইতিবাচক। অন্যদিকে, নানা কারণে জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে নানাবিধ বিভক্তি। মাঠ পর্যায়ে কয়েকটি জাতীয় নেটওয়ার্ক ও প্রক্রিয়ার সাথে স্থানীয়করণ প্রচারাভিযানের অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও সমন্বয় থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও স্থানীয়করন বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে ঐক্য এবং প্রতিনিধিত্ব কাঠামোর ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছে।

(ঘ) কোনও সংকট দেখা দিলে বা সরকারি কোনো সিদ্ধান্তের কারণে এনজিও/সিএসওদের কাজের আওতা সংকুচিত হলে **আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো একত্রে গিয়ে সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করে। এরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও/সিএসওগুলো অভিন্ন**

---

[16] www.cxb-cso-ngo.org
[17] www.coastbd.net এবং www.cxb-cso-ngo.org
[18] http://www.cxb-cso-ngo.org/wp-content/uploads/2019/02/English-CCNF-position-paper-on-JRP-2019_edited.pdf
[19] "NGO & Risk: Managing Risk in Uncertainty in Local – International Partnership, Good Practice and Recommendations for Humanitarian Actors" http://coastbd.net/wp-content/uploads/2019/03/riskii_partnerships_recommendations-1.pdf
[20] http://www.cxb-cso-ngo.org/2019/03/16/accelerating-localisation-through-partnerships/
[21] http://www.cxb-cso-ngo.org/2019/03/26/localisation-in-vanuatu-demonstrating-change_january-2019/

অবস্থান নিতে বা সরকারের সাথে দেন-দরবার করতে পারে না বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি দপ্তরে এনজিও/সিএসও নেতৃবৃন্দ ন্যূনতম সম্মান পান না। উপরন্তু, তারা কতিপয় আমলার দুর্নীতির শিকার হন।

(ঙ) সরকার, জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে প্রকল্প পাওয়া নিয়ে স্থানীয় এনজিও/সিএসওদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এই প্রতিযোগিতার ফলে তারা কিছু ন্যায্য ও গুরুত্বপূর্ণ দাবি-দাওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। যেমন তারা প্রায়শই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা ফি/ বা ওভারহেড কস্ট পায় না বললেই চলে (এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা রয়েছে)[২২]। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রকল্প সহায়তার বাইরে স্থানীয় সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য কোন তহবিল প্রদান করা হয় না। এমনকি কখনো কখনো প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সংগঠনের কাছে আর্থিক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়। নিজস্ব আয়ের উৎস নেই এমন স্থানীয় এনজিও/ সিএসওদের পক্ষে কোনও প্রকল্পে এই ধরনের অর্থ খরচ করা কঠিন। ফলে স্থানীয় সংগঠনের পক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যা তাদের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশিদারিত্বের নির্দিষ্ট কোনও নীতিমালা নেই, যার ভিত্তি হবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং স্থানীয় এনজিও-সিএসওদেরকে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্বশীল ও সার্বভৌম করে তোলার প্রচেষ্টা।

(চ) প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই বছরে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক এনজিওর জন্য অর্থ সাহায্য বাড়লেও, স্থানীয় এনজিও/সিএসও-এর জন্য বৈদেশিক অর্থ সাহায্য কমেছে। **আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিও সমান প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করছে।** যেমন রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচির জন্য ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফের মতো সংস্থা থেকে নির্বিশেষে সকলেই তহবিল সংগ্রহ করার জন্য আবেদন করছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার মান ও বাস্তবায়নে সক্ষমতায় অনেক পার্থক্য থাকায় স্থানীয়রা পিছিয়ে পড়ছে। তবে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে আনলে এই অসম প্রতিযোগিতার অবসান হতে পারত। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়[২৩] দেখা গেছে, রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতে অধিকাংশ তহবিলই এসেছে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক এনজিওর মাধ্যমে; জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ ৬৯%, আন্তর্জাতিক এনজিও ২০%, রেডক্রস-রেডক্রিসেন্ট ৭% এবং অন্যান্য এনজিও পেয়েছে মাত্র ৪%। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রাপ্ত তহবিলের প্রায় ৭৮% পেয়েছে এসিএফ নামের একটি সংস্থা। এই তথ্য ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের। এর পরে এ ধরনের আর কোনও হিসাব বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। যদিও সিসিএনএফ ক্রমাগতভাবে রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতে আসা তহবিলের ক্রমাগত স্বচ্ছতা দাবি করে আসছে।

অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, **কিছু আইএনজিও স্থানীয়করণ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। তবে তারা নিজেদের কাঠামোর অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরণ করছে এবং তারা আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য।** ভারতে কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও এ ধরনের স্থানীয়করণ করে স্থানীয় এনজিও সাথে প্রতিযোগিতা করে তহবিল সংগ্রহ করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় কর্মী নিয়োগকেই আন্তর্জাতিক সংস্থার স্থানীয়করণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এর কোনোটিই স্থানীয়করণ নয়। স্থানীয়করণ হচ্ছে স্থানীয় নেতৃত্ব, স্থানীয় সংগঠন এবং স্থানীয় কর্তৃত্ব। এই পরিস্থিতি স্থানীয় সংগঠনগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ এবং এই ধরনের আচরণ গ্রান্ড বারগেইন ও চার্টার ফর চেঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির বিপরীত।

(ছ) **স্থানীয় উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিও/সিএসও-এর জন্য দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আছে**, যেমন- (১) বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি পর্যায়ের কিছু প্রগতিশীল ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্থানীয় এনজিও-সিএসওদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে পার্টনারশিপে যেতে পারে। (২) দেশে বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিনিলিটি তহবিলের আকারও বাড়ছে। এই তহবিল যেন স্থানীয় সংগঠন পায়- এমন সরকারী নীতিমালর জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা ও দেন-দরবার করা উচিত।

(জ) স্থানীয় সংগঠনের তৈরি করা কর্মীদের ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া ইতিমধ্যে একটি সংকটে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদনে[২৪] বলা হয়েছে, মানব সম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় সংগঠনের বিনিয়োগের ফলটা ভোগ করছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা। চার্টার ফর চেঞ্জে স্থানীয় সংগঠনের কোনও কর্মীকে আন্তর্জাতিক এনজিওতে নিয়োগ দেওয়া হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির কারণ, আন্তর্জাতিক সংস্থার সমান উচ্চতর বেতন কাঠামো ও সুযোগ সুবিধা তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় একই পদের জন্য স্থানীয় সংস্থার কর্মীকে দেয়া হয় না। রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অতি দ্রুত বাড়ানো বেতন কাঠামোর ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে না পারার আশংকা রয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে **স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল সংস্থার জন্য একটা অভিন্ন বেতন কাঠামো ও একটি নৈতিকতাভিত্তিক নিয়োগ নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে বাংলাদেশের স্থানীয় সংগঠনসমূহের মানব সম্পদে যেমন একটি স্থিরতা আসবে, তেমনি সংগঠনগুলো স্থায়িত্বশীলতাও লাভ করবে।**

(ঝ) **এটা অনস্বীকার্য যে, এদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা, তাদের দেশি ও বিদেশি কর্মকর্তাদের এক সময়কার সহায়তামূলক মনোভাবের কারণেই এদেশে সফল স্থানীয় সংস্থা বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু বর্তমানে তাদের সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ বর্ধিত হতে থাকায় আগের সেই সহায়তার মহত্ত্ব ম্লান হতে শুরু করেছে এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোকে ক্রমাগত নির্ভরশীল করে তুলছে।** বিদেশি কর্মী নিয়োগ চাহিদা ভিত্তিক না হয়ে সরবরাহ ভিত্তিক হয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতে এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।

[22] http://coastbd.net/wp-content/uploads/2018/02/UROC.pdf
[23] https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-1_Rohingya_FINAL_Electronic_180618.pdf
[24] https://cafod.org.uk/content/download/41149/466719/version/5/file/Time%20for%20HR%20to%20Step%20Up.pdf

(ঞ) পাঁচতারকা মানের বা স্থায়িত্বশীলতাহীন বেশি খরচের যে সংস্কৃতি চলছে তা দারিদ্র দূরীকরণ মিশন বা সহায়তা তহবিলের মূল উৎস করদাতাদের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা কর্মসূচিসহ অন্যান্য অঞ্চলে কিছু জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে অতিরিক্ত বেতন প্রদান ও পাঁচতারা খরচের সংস্কৃতি লক্ষণীয়। নিত্যনতুন দামি গাড়ি চলমান বহরে যুক্ত হচ্ছে। সরকারের কর ব্যবস্থা ফাঁকি দেবার মতো ঘটনা ঘটছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচতারা হোটেলে অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণ আয়োজন, ব্যয়বহুলভাবে থ্যাংকস গিভিং উৎসব পালন ইত্যাদি এই ব্যয়কে আরো বর্ধিত করছে। আই-এনজিও ও জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর সদর দফতরে এ ধরনের পাঁচতারা খরচের সংস্কৃতি পরিহার করা হয়। কারণ, যাদের দান করা অর্থে এই সংস্থাসমূহ পরিচালিত হয়, সেই উন্নত দেশের কর প্রদানকারীরা এটা চান না। বরং তারা চান, তাদের দেয়া টাকা যাতে সরাসরি দরিদ্র মানুষ বা শরণার্থীদের কাছে আরো বেশি অনুপাতে যায়। দাবি সত্ত্বেও রোহিঙ্গা ত্রাণ কার্যক্রমে তহবিলের স্বচ্ছতা প্রকাশ করার ব্যাপারে IATI (International Aid Transparency Initiative) নীতিমালা অনুযায়ী তা এখনও কার্যকর হয়নি।

অন্যদিকে, আই-এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ তাদের অংশিদারের প্রকল্পে এ ধরনের ব্যয় অনুমোদন করে না। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবার ও উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণে যাতায়াতের ভাতা প্রদানেও কার্পণ্য করা হয়। একটি পাঁচতারা হোটেলের একরাতের ব্যয় দিয়ে একটি রোহিঙ্গা পরিবার বা একটি দরিদ্র পরিবারের স্থায়ী আয়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। জাতিসংঘ সংস্থা, আই-এনজিও বা স্থানীয় সংগঠন নির্বিশেষে সকলকে উন্নয়ন বা মানবিক কর্মকান্ডে পাঁচতারা খরচ ও অপচয়ের সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

৯। গোটা সেক্টরে এর প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যসমূহ

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এবং বাধাসমূহ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে দেন দরবার করার জন্য এমন একটি প্রক্রিয়া দরকার যার প্রধান লক্ষ্য হবে এ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা এবং বাংলাদেশে সার্বভৌম, স্থায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

এর উদ্দেশ্য শুধু উন্নয়ন বা মানবিক সংকটে সাড়া প্রদানই নয়, বরং সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে এই সেক্টরে একটি বৃহৎ ঐক্য প্রয়োজন।

কোনো সংগঠন বা নেটওয়ার্কের নিজস্ব পদ্ধতির ব্যাঘাত না করে, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও চলমান নেটওয়ার্কসমূহের কর্মপদ্ধতিকে কিছুটা প্রভাবিত করে (Taking Minimum Position) ন্যূনতম সমন্বয়ের মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে, বিশেষ করে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কাজ করার মতো একটি অভিন্ন প্রক্রিয়া।

প্রস্তাবিত এই প্রক্রিয়ার নাম হতে পারে **বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও কোর্ডিনেশন প্রসেস** (Bangladesh CSO/NGO Coordination Process) **বা সংক্ষেপে বিডিকোর্ডিনেশন** (BD Coordination)। এর মূল লক্ষ্য (Vision) হবে **সার্বভৌম, স্থায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিতাসম্পন্ন স্থানীয় সিএসও-এনজিও সেক্টর, যা স্বতস্ফূর্ত, সক্রিয় ও ইতিবাচকভাবে সরকার এবং বাজার বা প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ইতিবাচক এবং সম-অংশীদারিত্বসম্পন্ন সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মানবিকতা ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।**

এই প্লাটফরমের উদ্দেশ্য হবে:

(ক) দেশের সকল সিএসও-এনজিও খাত, বিশেষ করে স্থানীয় এনজিও-সিএসওগুলো যাতে স্থায়িত্বশীলতা নিয়ে দায়বদ্ধতার সাথে এবং সার্বভৌমভাবে গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে সর্বসম্মত ন্যূনতম অবস্থান (Common Minimum Position) নেওয়ার জন্য এই খাতের প্রধান শক্তিগুলোকে সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করা ও এই লক্ষ্যে জনমত তৈরির কাজ করা।

(খ) সিএসও-এনজিওদের প্রধান প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের জন্য জনমত তৈরি করা এবং প্রতিটি পর্যায়ে সকল সংগঠনের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

(গ) অংশীদারিত্বের নীতিমালা, গ্রান্ড বারগেইন এবং চার্টার ফর চেঞ্জ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে **সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সাথে দেন দরবার করা ও তাদেরকে এ বিষয়ে যথাযথ ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা**, যাতে স্থানীয় সংগঠনসমূহের প্রধান ভূমিকা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) **সরকারের সঙ্গে সকল পর্যায়ে ইতিবাচক সম্পৃক্ততা** প্রতিষ্ঠা করা।

এই ধারণাপত্রের সঙ্গে একমত হলে তার স্বাক্ষর হিসেবে লিংকে গিয়ে আপনার সংগঠনের বিবরণ প্রদান করুন।